গণিতায়ন

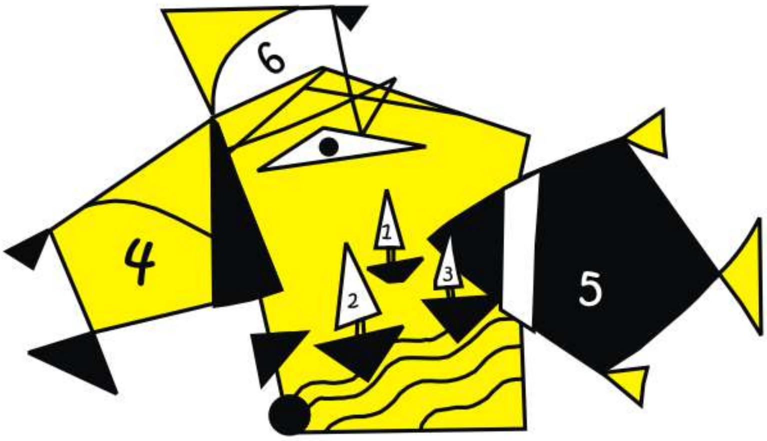

গণিত উৎসব বিশেষ সংখ্যা ■ প্রকাশঃ ২০১৯

গণিতায়ন

গণিত উৎসব বিশেষ সংখ্যা

২০ ও ২১শে সেপ্টেম্বর - ২০১৯

-ঃ ব্যবস্থাপনায় ঃ-

ভগবতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা

প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট

শিক্ষা আলোচনা, পশ্চিম মেদিনীপুর

গণিতায়ন

গণিত উৎসব বিশেষ সংখ্যা ■ প্রকাশঃ ২০১৯

যুগ্ম সম্পাদক ঃ-

অনুপম পারিয়া
টুম্পা গিরি

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ–

দিলীপ খাটুয়া
ড. সিদ্ধার্থ শংকর মিশ্র
অনির্বান কানুনগো
বাদল দাস
দীপাঞ্জন মিশ্র
অনিন্দ্য সুন্দর পাল
সমর মাইতি
অভিজিৎ প্রধান

প্রচ্ছদ ঃ-

সোমনাথ তামলি

রূপায়ণ ঃ-

সৌম্য মিশ্র

মুদ্রণ ঃ-

আর্ট ক্রিয়েশান
বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

সম্পাদকের খাতা

খাকুড়দা। খড়্গপুর-দীঘা রাজ্য সড়কের উপর অবস্থিত পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি গ্রাম্য শহর। ঋষি অরবিন্দের যিনি ছিলেন প্রধান সহযোগী, যাঁর পতাকার নকশার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯০৭ সালে ভারতের জাতীয় পতাকা রচনা করেন ভিকাজী কামা, সেই হেমচন্দ্র কানুনগোর স্মৃতি বিজড়িত খাকুড়দা আজ পুনরায় ইতিহাস রচনা করার প্রস্তুতিতে মগ্ন। এখানে ভগবতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে এমন একটি অনন্য মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যার থিম হলো শুধুমাত্র গণিত। মেলার মূল উদ্দেশ্য হলো গণিতের প্রতি ভীতি দূর করে তাকে আকর্ষনীয় করে তোলা।

আমাদের জীবনের গণিতভীতির ভিত্তি শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই। তাই আমাদের লক্ষ্য হলো মুলতঃ প্রাথমিক শ্রেণির পড়ুয়ারাই। দুদিন ব্যাপী এই মেলার ক্যুইজ, অঙ্কন, মডেল প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব-ই হবে সম্পূর্ণ গণিতের আঙ্গিকে। এভাবেই প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্টের ভাবনায় স্থাপিত শিক্ষা আলোচনা নিত্যনতুন পরিকল্পনা যেমন পঠন মেলা, সৃজনী মেলা, স্বাস্থ্য মেলা, ভাষা উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়গুলিকে প্রাঞ্জল করে তুলতে বদ্ধপরিকর। গণিত উৎসব তারই প্রতিফলন।

এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল প্রায় মাস তিনেক আগে, বিভিন্ন আশঙ্কাকে সঙ্গী করে। কিন্তু আমরা, অর্থাৎ ভগবতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র, প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট ও শিক্ষা আলোচনা, পশ্চিম মেদিনীপুর মিলে শপথ নিয়েছিলাম মেলার বাস্তবায়নের। কারন, কাজটি সত্যিই খুব সহজ ছিলো না। উপযুক্ত পরিকল্পনা; পরিকাঠামো নির্মাণ; অজস্র শিক্ষণ-শিখন সহায়ক উপকরণ স্থাপন; সেগুলিকে প্রদর্শনের ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করা; যেহেতু বেসরকারী উদ্যোগ তাই অর্থের সংস্থান করা; সর্বোপরি যত অধিক সংখ্যক সম্ভব ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা সবই-ই করা হয়েছে এই সময়কালে।

কলকাতার অনাথ আশ্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর বেসরকারি উদ্যোগে হওয়া রাজ্যের দ্বিতীয় গণিত মেলায় অংশগ্রহণ করে আমাদের মনোবল ও আগামী দিনে আরো নতুন কিছু করার জেদ বাড়িয়ে তোলার জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিনম্রচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ শ্রীমতী অনিতা অগ্নিহোত্রী মহাশয়াকে, সমাজকর্মী শ্রীমতী উষা মিশ্র মহাশয়াকে, জাতীয় শিক্ষক শ্রী উৎপল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে, ভগবতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষানুরাগী সকল পৃষ্ঠপোষকদের।

গণিতকে ভয় পাওয়া নয়, গণিত মজারও নয়

কুমার রাণা

"দুটি সংখ্যার গ.সা.গু. সংখ্যা দুটির পরমদূরত্বকেও নিঃশেষে ভাগ করে এবং সংখ্যা দুটির পরমদূরত্ব ও তাদের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার গ.সা.গু মূল সংখ্যা দুটির গ.সা.গু. এর সমান। ...বড় সংখ্যাটি থেকে ছোট সংখ্যাটি বিয়োগ করে বিয়োগফল এবং ছোট সংখ্যাটি নিয়ে আবার একই কাজ করা হলে এক সময় বিয়োগফল এবং ছোট সংখ্যাটি সমান হয়ে যাবে, আর আমরা বুঝতে পারি দুটি সংখ্যা সমান হলে তাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হবে এই সংখ্যাটিই। তাহলে অবশেষে আমরা...গ.সা.গু. পেয়ে যাবো।" – উদ্ধৃতিটি উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া, আজ ২০১৯ এর ১৫ই সেপ্টেম্বর, সকালবেলা। যতদূর স্মরণে আনতে পারি– আমার স্মৃতি খুব দুর্বল নয়– পঞ্চাশ বছরেরও বেশি আগে যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তাম তখনও আমাদের গণিত বইতে গ.সা.গু. বিষয়ে মোটামুটি এইরকম একটা বর্ণনা ছিল। শিক্ষক মহাশয় মুখস্থ করিয়েছিলেন– গ.সা.গু. হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। মনে রাখলাম, অথচ মনে তার কোনো ছাপ পড়ল না। মনের ভেতর কোনো আলোড়ন তো দূর তার উপস্থিতিও টের পাওয়া গেল না। শিক্ষক মহাশয় শেখালেন কী করে ভাগের সাহায্যে গ.সা.গু. বের করা যায়। তা-ও করলাম, কিন্তু বুঝলাম না কিছুই– কেন এটা করছি, এটা কোন কাজে লাগে, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা তৈরী হল না। ফল, যখন সংখ্যা দিয়ে বলা হল গ.সা.গু. কর, করে ফেললাম, ফুল মার্কস্ পেলাম; কিন্তু, যখন একটা প্রশ্ন দেওয়া যেটা নাকি গ.সা.গু.-র সাহায্যে সমাধান করতে হবে, শূন্য পেলাম। পরিণতি, সেই শৈশবে গণিতের যে দুর্বোধ্য রূপটা মাথায় গেঁথে গেল তা উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়তে হাইস্কুলে গণিতের ক্লাসে

জানলা টপকে পালানো, কলেজে গণিতের প্রশ্নের উত্তরে কাগজের শুভ্র শুদ্ধতা বজায় রাখার দিকে একাগ্র হওয়া।

এ অভিজ্ঞতা সর্বজনীন নয়। আমার কোনো কোনো সহপাঠী একই পদ্ধতিতে গণিতে প্রভূত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে – পরীক্ষায় একশোতে একশো পেয়েছে। তাহলে, শিক্ষকরা যেমন বলতেন সেটাই ঠিক ? সমস্যাটা এসেছে আমার মেধার অভাব থেকে ? গণিত বুঝতে পারার মতো বুদ্ধি না থাকার কারণে ? ঠিক বলেই মেনে নিয়েছিলাম, কেননা আমাদের শেখানো হয়েছিল, শিক্ষক যা বলেন সেটাই ঠিক (প্রথম কোনো শিক্ষিকার দেখা পেলাম কলেজে পড়তে গিয়ে)। শিক্ষক শুধু না, বয়সে বড় পুরুষরা কেউ ভুল বলতে পারেন না, এমনটা কল্পনা করাও ছিল পাপ। সুতরাং মেনে নিয়েছিলাম, গণিত শেখা আমার কম্মো নয়, গণিত বাদ দিয়ে যে টুকু শেখা যায় তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

কিন্তু, সেটা কি সম্ভব ? সভ্যতার ঊষাকাল থেকে গণিত মানুষের সঙ্গী– শিকার করা পশুর সংখ্যা গোনা, রাত্রিবাসের ছাউনি বানানো, চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করা, যজ্ঞের বেদী গড়া, পোড়ামাটির পাত্র নির্মাণ থেকে শুরু করে আজকে মহাকাশ অভিযান পর্যন্ত যে অগ্রগতি তার প্রতি ক্ষেত্রেই কোনো না কোনা ভাবে গণিতের প্রয়োজন ও ভূমিকা থেকেছে। গণিত বাদ দিয়ে মানব সভ্যতা বলে কিছু হয় না। অগ্রগতির প্রথম সোপান হচ্ছে জ্ঞান অর্জন এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগ। যে প্রাচীন গ্রীক 'ম্যাথিমা' থেকে আজকের ম্যাথামেটিকস কথাটা এসেছে তার অর্থ ছিল 'শেখা বা জানা'। ল্যাটিন ম্যাথামেটিকাতে এর অর্থ গণিতের কলা। গণিতকে বাদ দিয়ে জানবার সুযোগ খুব কম। আবার একে বাদ দিয়ে দৈনন্দিন কাজ চালানোও কঠিন। সে-দিক দিয়ে গণিত হয়ে উঠল জ্ঞানের অনুশীলন, এবং একই সঙ্গে প্রয়োগিকভাবে অপরিহার্য একটি বিদ্যা। সুতরাং গণিতের মৌলিক কিছু ধারণা সব মানুষেরই থাকে। যেটা থাকেনা

তা হল যে-ভাবে বস্তুকে ধারণায় পরিবর্তিত করা হচ্ছে (যেমন সংখ্যা বা পরিমাপের একক বা চিহ্ন ইত্যাদি) সেই প্রক্রিয়াটা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। গণিত তো আসলে যুক্তির শৃঙ্খলা, ঠিক কীভাবে সেই শৃঙ্খলাটা গড়ে ওঠে, সেটা সবার পক্ষে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। কেউ কেউ আছেন অতি সহজে মূর্ত (ধরা যাক বস্তু) থেকে বিমূর্ত (ধরা যাক গণিতিক সংখ্যা বা সূত্র) তে চলে যেতে পারেন, আবার আমার মতো লোকেদেরও নিজেদের একা ভাবার কারণ নেই– চিহ্ন, সূত্র, সংখ্যা, ইত্যাদির আভ্যন্তরীণ কাহিনীগুলো বুঝে ওঠা যাদের কাছে বেশ আয়াসসাধ্য।

গণিতশিক্ষার প্রক্রিয়াটাও তাই বিষয়টার মতো জটিল– এই বিদ্যা দানের জন্য কোনো একমাত্রিক পদ্ধতি হতে পারে না। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য পদ্ধতির ফের বদল ঘটবার কারণ আছে। বিশ্বজুড়ে এ নিয়ে নানা গবেষনা চলছে, কিভাবে শেখানোর পদ্ধতিকে আরো উন্নত করে তোলা যায় যাতে কঠিনতার ভয়ে কেউ গণিত ছেড়ে পালিয়ে না যায়। প্রত্যেকেই যাতে গণিতকে বিষয় হিসেবে চর্চার,এবং সেই সঙ্গে জীবনের, অনুশীলনের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারে তার নানা অনুসন্ধান চলছে। আমাদের সৌভাগ্য আমাদের রাজ্যের অনেক প্রাথমিক শিক্ষক এ ব্যাপারে অগ্রণী গবেষকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

সেই সঙ্গে একটা কথা যোগ করা দরকার। গণিত-কে খুব মজার একটা বিষয় বলে কিছু বুজরুকিও চলে। গণিত খুব মজার ব্যাপার নয়– অংক করতে কারো ভাল লাগতে পারে, কেউ কঠিন অংকের সমাধান করে মজা পেতেই পারে। কিন্তু, এটাকে মজার ব্যাপার বলাটা পৃথিবীর যাবতীয় জটিলতাকে তরল করে দেওয়া। মূর্ত থেকে বিমূর্ত হওয়া মাত্রই বস্তু অধিকতর জটিল হযে পড়ে, সেই জট ছাড়াবার কাজটা সহজ নয় বলেই সেই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করা। গণিত শেখা মানে আসলে জীবনের যাবতীয় জটিলতা, কঠিনতা, দুর্ভেদ্যতাকে জয় করার শিক্ষা। কোনো কিছু

অজেয় নয় বলেই তা সহজ হয়ে যায় না– এই উপলব্ধিটা বোধ হয় আজকের ভারতবর্ষে অনেক বেশি জরুরি। যেখানে যুক্তিকে বাস্তুচ্যুত করছে ভাবাবেগ, সুক্ষ্ম চিন্তাকে বলা হচ্ছে অনাবশ্যক কচকচি, উচ্চতর জ্ঞানচর্চাকে সম্পূর্ণ অপাংক্তেয় করে দিয়ে তার জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাটোয়ারী বুদ্ধির চর্চাকে, সেখানে গণিতের অনুশীলনটাকে সুরক্ষিত না রেখে আমরা সভ্যতাকে বাঁচাতে পারব না। গণিত, কেবল সংখ্যার ব্যাপার নয়, গণিত হচ্ছে মানুষের সম্মুখে এগোবার দর্শন। গণিতশিক্ষায় আমরা গণিতের এই বৃহত্তর পরিসরটার কথা মাথায় রাখলে হয়তো উপকৃত হব।

দৌড়ে এস, সক্কলে

অনিতা অগ্নিহোত্রী

নামতা যদি ভুলতে থাকো, অঙ্কে ভীষণ ভয়, তবে
ছুট্টে এস, মজার খেলায়, শরৎ কালের উৎসবে।
ঈদ নয় কি দুগ্গা পুজো, কিন্তু খুশি সেই রকম
গণিত নিয়ে উৎসব তার পেখম জোড়া রং-বেরঙ।
অঙ্ক নিয়ে ধাঁধা, গণিত-প্রদর্শনী, বীজগণিতের
সূত্র গুলি সহজ করে সাজিয়ে দেয়ার রকম ফের।
এসব খেলা খেলবে কারা! কেন, আমরা সক্কলে!
অঙ্ক স্যারের ঝলমলে মুখ অ্যালজেব্রার জঙ্গলে

পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, পাটিগণিত ও জব্দ বেশ–
দৌড়ে এস গণিত মেলায়, ডাকছে তোমায় আঁকের দেশ!

গণিতের ম্যাজিক

ঊষা মিশ্র

স্কুলে যতকিছু পড়তে হত তার ভেতর আমার সবথেকে প্রিয় ছিল গণিত। তোমাদের ভেতর যারা একথা শুনে ভাবছ আমি খুব পড়ুয়া ছিলাম নিশ্চই– তারা এক্কেবারেই ভুল ভাবছ। গণিত ভাললাগার কারণই ছিল গণিতে কিছুই পড়তে হয় না। ইতিহাসে পাতার পর পাতা রাজা রাজড়ার যুদ্ধের সাল তারিখ, বিজ্ঞানে দাঁতভাঙা ল্যাটিন নাম, বাঙলা বা ইংরেজি পরীক্ষাতেও শুধু গল্প টুকু পড়ে নিলেই ছুটি নেই– তাকে কাটাছেঁড়া করে কে কবে কাকে কেন একথা বলেছে– সেসব নিয়ে অনেক কিছু লিখতে হত। আর গণিত– সে শুধু করার ব্যাপার, করে যাও, গাছে চড়ার মত, সাঁতার কাটার মত– সক্রিয় এক কাজ। করতে বসলে ঘুম ছেড়ে যাবে। মন যদি চলেও যায় বাইরের খেলার মাঠে তবু গণিত নিজেই টেনে আনবে মনটাকে খাতার পাতায়। ধাঁধা যেমন মজার, প্রতিটি অঙ্কই তেমন এক একটা ধাঁধা। মা যখন বকত, বলত পড়তে বস– আমি অঙ্ক খাতা খুলে বসে পড়তাম। অন্য বইগুলোতে পাতার পর পাতা লেখা দেখলেই ঘুম পেয়ে যেত বলে ফাঁকি দিতেই অঙ্ক করতাম। অবশ্য তার শাস্তিও পেয়েছিলাম পরীক্ষার খাতায়। অঙ্কে পুরো নম্বর পেলেও ইংরেজীতে পাশ করতেই কাল ঘাম ছুটত প্রতিবারেই।

অথচ আমার মেয়েরাই দেখতাম কিছুতেই অঙ্ক করতে চাইত না। মোটা মোটা বই পড়ে ফেলে অথচ অঙ্ক করতে বললেই নানান বাহানা। আজকাল বুঝতে পারি কেউ কেউ হাতে কলমে কাজ করতে ভালোবাসে কেউ আবার অন্যের কাজ পড়ে বুঝতে ভালবাসে। প্রাচীন গ্রীসে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম ছিলনা। ম্যাথমা, মানে জ্ঞান– সেখান থেকেই এসেছিল ম্যাথেমেটিক্স কথাটা। জ্ঞানী লোক মাত্রেই ম্যাথমেটিসিয়ান– এভাবেই ভাবত ওরা। আমার নিজের ক্ষেত্রে অবশ্য অঙ্কটা ধাঁধার মজা হয়েই থেকে গেছে, জ্ঞান অব্দি পৌঁছানো আর হয়নি। তাই বলে তোমাদের ক্ষেত্রেও একই ঘাটতি থাকবে না কেন ? তোমাদের

ভেতর অনেকেই গণিত ভালবাসনা হয়ত এর ভেতরের মজাটায় ঢুকতে পারোনা বলেই। যখন গণিতে যাদের অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁদেরই হাত ধরে, তাদের চোখেই তোমাদের সঙ্গে আলাপ হবে গণিতের – তখন গণিতের আরেকটা রূপ দেখতে পাবে তোমরা। দেখতে পাবে কিভাবে গণিতের সাহায্যেই প্রাচীন মানুষ মন্দিরের চূড়ো তুলত, পিরামিড নির্মাণ করত। কিভাবে তারা প্রথম ক্যালেন্ডার বানিয়েছিল, পৃথিবীর বিশালতার ধারণা করেছিল, নক্ষত্রের যাত্রাপথ আন্দাজ করেছিল। পরে তো গণিতই হয়ে উঠল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভাষা। খাতায় বসে আঁক কষে বলে দেওয়া ফের কবে সূর্যগ্রহণ – একসময় এটাই ছিল ম্যাজিক। এখন তোমরাই শিখে নিতে পারো গণিতের এই ম্যাজিক।

আশা করি এই গণিত-উৎসব তোমাদের শেখাতে পারবে কিভাবে তোমরা গণিতের প্রতি তোমাদের ভয় ভ্রান্তি পেছনে ফেলে নতুন একটা মন নিয়ে তার মজাটা দেখতে পাও। আর যারা আগে থেকেই গণিত ভালবাসো তারা পাবে মজাটাকে জ্ঞানে উত্তীর্ণ করার সুযোগ। প্রাচীন ম্যাজিক তোমাদের চেতনায় বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরী করবে– এই আশা নিয়ে, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই শেষ করি।

অঙ্কের খেলাঘর

উৎপল মুখোপাধ্যায়

প্রতি বুধবার এমনটাই হয়, টিফিনের পর যেই ক্লাস শুরুর ঘন্টা পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা হো-হো করে স্কুল থেকে বেরিয়ে মাঠে যাওয়ার জন্য দৌড়ায়। ছুটাছুটি ঠেলাঠেলিতে প্রায়ই কেউ না কেউ পড়ে যায়। তারপর কান্না, অভিযোগ থাকবেই। তবু কী এক নিদারুণ আকর্ষণে তারা আগের আঘাত ভুলে গিয়ে এমনটা করে তা কিছুতেই বড়দির মাথায় ঢোকে না। এর জন্য শ্রীজনবাবুকে ভর্ৎসনা কম শুনতে হয় না- "এক চিলতে মাঠ। কী দরকার ওখানে নিয়ে গিয়ে ক্লাস করানো ? ওখানে যেতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা পড়ে গিয়ে কোনো অঘটন ঘটলে আপনি জবাবদিহি করবেন।" শ্রীজনবাবু এইসব কথা আমল দেন না। তিনি মনে করেন খেলার ক্লাস কেন, কোনো ক্লাসই চার দেওয়ালে বন্দি থেকে হয় না।

ঘন্টার আওয়াজ পেতেই ছাত্রছাত্রীরা আগেই মাঠে চলে গিয়েছিল। শ্রীজনবাবু অভ্যাস মত তাঁর জলের বোতল থেকে ঢক্ ঢক্ করে বেশ খানিক জল পান করেই অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে পা বাড়ালেন। স্কুলের এই মাঠটা ছোটো, তবে এক চিলতে বলতে ভুল বলা হবে। এইটুকু মাঠও তো সব স্কুলে মেলে না। সুতরাং- 'আছে যখন, ব্যবহার করব না কেন ?' শ্রীজনবাবুর তেমনই অভিমত।

মাঠে শ্রীজনবাবুকে আসতে দেখেই ছাত্র-ছাত্রীরা হল্লা শুরু করে দিলে। 'সবাই হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়াও'-স্যারের নির্দেশ শোনা মাত্র সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর সেই অবসরে শ্রীজনবাবু ঠিক করে ফেললেন আজকের খেলাটা কী ধরনের হবে, কী কী সামর্থ্যের অনুশীলন আর মূল্যায়ন করা যায়। মাঠে একটা অশ্বত্থ গাছ আর একটা আম গাছ আছে। শীতের আভাস থেকেই শুরু হয়েছে তাদের পাতা ঝরা। অনেক পাতা ঝরে মাটিতে পড়ে আছে- 'আজ আমরা একটু অন্যরকম খেলা করব। খেলাটার নাম...' এটুকু বলেই তিনি থামিয়ে মুভি ক্যামেরার মত তিনি সকল ছাত্রছাত্রীদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। সবাই উদগ্রীব খেলার নাম জানার জন্য। হই হই শুরু হয়ে গেল- 'কী নাম স্যার ?' শ্রীজনবাবু হেসে বললেন- 'পাতা কুড়ানি।' সীমা, জয়ন্তী, বাবুলাল, শ্রেয়া একসাথে বলে উঠল-'বুঝতে পেরেছি। পাতা কুড়াতে হবে।' শ্রীজনবাবু ঘাড় নাড়লেন, বললেন– 'পাঁচ মিনিট সময়। এর মধ্যে কে কতগুলো পাতা কুড়াতে পার, আমি দেখব।' এই বলে ঘড়ি দেখে বললেন 'রেডি ওয়ান, টু,থ্রি স্টার্ট।' শ্রীজনবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই সবাই পাতা কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে গেল। শ্রীজনবাবু মাঠের ধারের বেদীর ওপর গিয়ে বসলেন। মুহুর্তের মধ্যে মাঠটা পরিষ্কার হয়ে গেল। পাতা কুড়িয়ে সবাই ছুটে এল তাঁর কাছে।

শ্রীজনবাবু বললেন-'এবার কে কতগুলো পাতা কুড়িয়েছো গুণে ফেল।' এবার তাদের মধ্যে পাতা গোনার ব্যস্ততা শুরু হল। শ্রীজনবাবু প্রত্যেকের গোনার কায়দা লক্ষ্য করতে লাগলেন। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী এক, দুই, তিন... এইভাবে গুণছিল। সীমা সব পাতা মাটিতে ফেলে তুলে তুলে পাশে রেখে গুণছিল। তার হাতে কখনো একটা পাতা উঠছিল, কখনো বা দুটো কিংবা তার বেশি। তার গোনার ধরণটা ছিল 'দুই একে তিন, তিন দুই পাঁচ, পাঁচ তিনে আট, আট পাঁচে তেরো।' বাবুলাল প্রথমে পাতাগুলো পাঁচটা পাঁচটা করে সাজিয়ে রাখল। বাড়তি দুটো আলাদা রাখল। তারপর গুণতে শুরু করল- 'পাঁচ পাঁচে দশ, দশ পাঁচে পনেরো.. আর দুই-এ।' সবার গোণার কৌশল দেখে শ্রীজনবাবু বেশ মজা উপভোগ করছিলেন। মনে মনে রবি ঠাকুরকে একবার প্রণাম করে নিলেন। বন্ধনহীন খোলা আকাশের নীচে নির্মল বাতাসে শেখার এই আনন্দ তিনি বুঝেছিলেন বলেই না শান্তিনিকেতন গড়েছিলেন। শ্রীজনবাবুর রবিভাবনায় ছেদ পড়ল। সবাই ছুটে এসে কে কতগুলো পাতা কুড়িয়েছে সেই সংখ্যা জানাবার জন্য চিৎকার শুরু করে দিলে। শ্রীজনবাবুর মাথায় অন্য মতলব খেলে গেল। তিনি আঠারো জন ছাত্র-ছাত্রীকে তিন-তিন করে ছয়টি দলে ভাগ করে দিলেন। তারপর বললেন- 'তোমরা দলে বসে দেখো, কী করলে দলের প্রত্যেকের কাছে সমান সংখ্যক পাতা হবে।' প্রথমে ছাত্রছাত্রীরা একটু হকচকিয়ে গেল। শ্রীজনবাবু তাদের আরো বুঝিয়ে বলতে উদ্যোগী হলেন। বললেন- 'তোমরা দলে তিনজন করে আছো। দেখো তোমার বন্ধুদের কাকে কটা পাতা দিলে বা কটা নিলে সবার সমান হয়।' সীমা, শ্রেয়া, জয়ন্তী 'বুঝেছি, বুঝেছি' বলে হই হই করে যে যার দলে কাজ শুরু করে দিলে। বাকিরাও তাদের দেখাদেখি দলের কাজ শুরু করল। শ্রীজনবাবুর মুভি ক্যামেরা ঘুরতে থাকল। বাবুলাল আটকে গেছে। ওর দলে সকলের পাতা সমান করার পর একটা বেশি হচ্চে। কী করবে ভেবে না পেয়ে বাবুলাল দলবল নিয়ে ছুটে এল। 'স্যার, একটা বেশি হচ্ছে। বিষ্ণু বেশি পাতা কুড়িয়েছে। বেশিটা ওকে দিয়ে দেব?' বাবুলালের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজনবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন-'না। তাহলে তো সবার সমান হবে না।' বাবুলালরা চিন্তায় পড়ে গেল। বিষ্ণু বললে- 'তাহলে স্যার একটা পাতা ফেলে দিই।' শ্রীজনবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন- 'বাড়তিটা আমাকে দাও।' বাকিরাও তাদের দলের সমস্যা নিয়ে হাজির হল। শ্রীজনবাবু অঙ্কের খেলাঘরে হারিয়ে গেলেন। সম্বিত ফিরল বড়দির কণ্ঠস্বরে- 'এবার ওদের ছাড়ুন, মাঠে সব ক্লাসের একসাথে ব্রতচারী শুরু হবে।' ব্রতচারী শুরু হল।

"ছুটব, খেলব, হাসব..." শ্রীজনবাবু মনে মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন- "খেলতে খেলতে শিখব।"

বৈদিক পদ্ধতিতে গুণ (Multiplication)

পার্থ কর্মকার

আমরা জেনেছি একাধিক যোগ-এর অর্থ গুণ। এই সাধারণ গুণ বড়ো হলে তা জটিল হয়ে পড়ে। এর ফলে মনে মনে গুণ করা ও দ্রুত লেখা সম্ভব হয় না। প্রচলিত নিয়মে গুণের অঙ্ক করতে হলে নামতা জানার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং নামতা জানা ব্যক্তি প্রথমে সহজে গুণ করতে পারে। তবে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে গুণ করলে অনেক সময় লাগে।

বৈদিক সূত্রের মাধ্যমে অতি সহজে গুণ করা যায়। বৈদিক গণিতের নিয়মে গুণ করতে হলে 5 পর্যন্ত নামতা জানলেই হয়। মানুষের জীবনে অভ্যাসের ফল হল যে 10 পর্যন্ত নামতা জেনে মনে মনেই যে কোনো অঙ্কের গুণ করা। বৈদিক গণিতে শেষ বা নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। বৈদিক গণিতে গুণের বিষয়টি আপেক্ষিক। গুণ করার জন্য নিম্নলিখিত সূত্রগুলির প্রয়োজনঃ

নিখিলং নবতশ্চরমং দশতঃ

এক ন্যূনেন পূর্বেন

যাবদূনম্ তাবদূনম্

'নিখিলং নবতশ্চরমং দশতঃ– এই সূত্রটির ইংরাজিতে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় "All from nine and the last from ten"। বাংলায় এর অর্থ- সব অঙ্ক নয় থেকে এবং শেষ অঙ্ক দশ থেকে। সূত্রটি ইংরাজিতে লিখলে হয়–

(১) Nikhilam Navatascarmam Dasatah গুন করার আগে সাপেক্ষ সংখ্যা স্থির করতে হলে সাপেক্ষ সংখ্যাটি হবে 10 । 100 । 1000 । 10000 ইত্যাদি।

উদাহরণ ঃ - 9 x 6 -এক্ষেত্রে আমরা সাপেক্ষ সংখ্যাটি 10 ধরলাম। '9', '10' এর থেকে 1 সংখ্যা কম এবং '6', '10' এর থেকে 4 সংখ্যা কম। বিষয়টি বোঝার জন্য এভাবে লিখবো -9-1/6-4

এখন 9 থেকে 4 বিয়োগ ও 6 থেকে 1 বিয়োগ করব।

উভয় ক্ষেত্রে উত্তর 5

অতএব 9x6 এর গুণফলের প্রথম সংখ্যাটি 5 ।

এবার 1x4 এর গুন করার গুনফল হবে 4

অতএব 9x6 এর গুণফলের দ্বিতীয় সংখ্যাটি 4।

অতএব 9x6 = 54

দুই অঙ্কের সংখ্যাদ্বয় গুণের ক্ষেত্রে, সাধারণ পদ্ধতিতে প্রচুর সময় ও জায়গার প্রযোজন হয়। বৈদিক গণিতের সাহায্যে সহজেই প্রায় মনে মনেই এই গুণ করা যায়। এক্ষেত্রে যেহেতু 1এর পর দুটি 0 (শূন্য) ধরছি তাই প্রতিবার আমরা দুটি করে সংখ্যাকে আমাদের হিসাবের মধ্যে ধরব। যদি গুণ করে তিন অঙ্কের সংখ্যা পাওয়া যায় তখন তৃতীয় অঙ্কটিকে প্রথম দুই অঙ্কের সাথে যোগ করব।

উদাহরণ ঃ 97 x 88 এক্ষেত্রে সাপেক্ষ সংখ্যাটি ধরব 100। 88,100 থেকে 12 সংখ্যা কম এবং 97, 100 থেকে 03 সংখ্যা কম। এখন বিষয়টিকে আমরা আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে লিখব 97 - 03 / 88-12.

এখন 97 থেকে 12 বিয়োগ করে অথবা 88 থেকে 03 বিয়োগ করে উভয় ক্ষেত্রে একই বিয়োগফল পাই এবং বিয়োগফল হল 85।

অতএব 97x88 এর গুণফলের প্রথম দুটি সংখ্যা 85, এখন 03x12 গুণ করে পাই 36। 97x88 এর গুণফলের শেষে দুটি সংখ্যা 36। অতএব আমরা বলতে বা লিখতে পারি যে 97 x 88=8536

তিন অঙ্কের সংখ্যাদ্বয়ের গুণ করার ক্ষেত্রে সাধারণ পদ্ধতিতে প্রচুর সময় ও জায়গার প্রযোজন হয়। বৈদিক গণিতের সাহায্যে সহজেই

প্রায় মনে মনেই এই গুণ করা যায়। এক্ষেত্রে যেহেতু পর পর তিনটি 0(শূন্য) ধরছি তাই প্রতিবার আমরা তিনটি করে সংখ্যাকে আমাদের হিসাবের মধ্যে ধরব। গুণ করে যদি চার অঙ্কের সংখ্যা পাওয়া যায় তখন চতুর্থটিকে প্রথম তিন অঙ্কের সাথে যোগ করব।

উদাহরণ ঃ 998 x 985 -এক্ষেত্রে সাপেক্ষ সংখ্যা ধরব 1000। এখন 998, 1000 থেকে 002 কম এবং 985, 100 থেকে 015 কম। এখন আমরা আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিতভাবে লিখবো। 998-002 / 985 - 015.

এখন 998 থেকে 015 বিয়োগ অথবা 985 থেকে 002 বিয়োগ করে বিয়োগফল পাই 983। 998 x 985 এর গুণফলের প্রথম তিনটি সংখ্যা 983।

অতএব এখন 002 ও 015 গুণ করে পাই 030...। অতএব 998 ,985 এর গুণফলের শেষ তিনটি সংখ্যা 030। অতএব আমরা লিখতে বা বলতে পারি 998 x 985 = 983030

'গণিত উৎসব' প্রসঙ্গে

কার্ত্তিকচন্দ্র আচার্য্য

সময়টা বড্ড অস্থির। আবহমান কাল ধরে লালিত মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতি-নীতি সবটাই কেমন সমকালীন রাষ্ট্রিয় অভিমুখ ও সমাজের তথাকথিত নিয়ন্ত্রকদের আচরণের সাথে সামঞ্জস্যহীন। ব্যক্তিগত কিম্বা সমষ্টিগত যে কোন পদক্ষেপ বা উদ্যোগের সাথে একান্ত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ভাবনার স্পষ্ট প্রকাশ। এই রকম একটা পরিবেশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালনা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ভাবনার উর্দ্ধে থেকে সামাজিক বিকাশের যথার্থ শরিক হয়ে ওঠার চেষ্টা, একান্তই কষ্টসাধ্য। আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'বড়মোহনপুর ভগবতী দেবী নারী কল্যাণ সমিতি' প্রায় দুই দশকের অধিক সময় ধরে সেই কষ্টসাধ্য প্রয়াসে ব্রতী হয়ে রয়েছে। এই প্রতিকূল চলমানতায় অনেক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য থাকলেও যথার্থ সম-মানসিকতার সংস্থাগত সাহচর্য একান্তই বিরল।

এক বছর আগে প্রতীচী ট্রাষ্ট ও শিক্ষা আলোচনার সংগঠকদের সাথে যৌথ কর্মসূচীর আলাপচালিতায় পারিপার্শ্বিক নেতিবাচকতা পরিহার করে সমস্ত প্রকারের রাজনৈতিক মতাদর্শগত সঞ্জাত ও পেশাগত দাবী-দাওয়ার আলোচনা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ইতিবাচক উপাদান সমূহকে পাথেয় করে শুধুমাত্র মনের টানে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এদের বিকাশ সাধনে নিয়োজিত হওয়ার মত বিশুদ্ধ ভাবনা নিয়ে, এগিয়ে যাওয়ার পরিচয় ফুটে ওঠে, – যা আজকের দিনে যথার্থ দুর্লভ।

তাই আমাদের সমিতি পরিচালিত 'ভগবতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা'র সাথে যখন যৌথভাবে এখানে 'গণিত উৎসব' আয়োজনের প্রস্তাব আসে, - আমরা সর্বসম্মতভাবে তা গ্রহণ করি।

স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত এই আয়োজন, চিরাচরিত মেলা বা উৎসব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। গণিতের মতো আপাত জটিল বিষয়ের অন্তরালে থাকা আনন্দের ফল্গুধারাকে নানান আঙ্গিকে শিক্ষার্থীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই প্রত্যন্ত এলাকার অগণিত শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষনীয়ভাবে উপস্থাপিত করার সার্থকতাতেই এর সাফল্য। নামকরণে প্রতিফলিত দুই আপাত বৈপরীত্যভরা উপাদানের যথার্থতা প্রতিপাদনই হয়ে উঠুক আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

খাকুড়দা ও তার সন্নিহিত এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই সুস্থ চিন্তা ও সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ নানান কর্মসূচী আয়োজিত হয়। প্রতীচী, শিক্ষা-আলোচনা ও ভগবতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ-সংস্থার এই সমবায়ী অনন্য উদ্যোগের সার্থক রূপায়নে আগামী দিনের জন্য আরও নানান প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের দিগন্ত উন্মোচিত হোক, যা সামাজিকতা ও মানবিকতার পরিসরকে প্রসারিত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের যথার্থ শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে তুলতে অনবদ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংখ্যার ধারণা দেওয়ার কয়েকটি শিক্ষণ কৌশল

ড. আব্দুল হাই

গণিতের ব্যবহার শুরু হয় আদিম যুগ থেকেই। গণিতের সৃষ্টির মূল রহস্য - 'অ-সাম্য' থেকে। অ-সাম্য নানান ভাবে দেখা যায়– যথা 'কম-বেশী', 'ভারী-হাল্কা' এবং 'লম্বা-খাটো'। তাই আমাদের প্রথম অ-সাম্য চিহ্নিত করনের মধ্য দিয়ে শুরু করতে হবে। বাস্তব জীবনে শিশুর পারিবারিক পরিবেশ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত জীব উদ্ভিদ ও বস্তু থেকে অ-সাম্য চিহ্নিতকরনের কাজ শুরু করতে হবে। এই পর্যায়ে বিভিন্ন ছবি, মডেল, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন।

এই অ-সাম্য থেকেই কৌতুহল জন্মাবে– কত বেশী / কম, কত লম্বা/ খাটো, কত বেশী ভারী / হাল্কা জানার। ক্রমান্বয়ে সংখ্যার ধারণা, গননা ও দৃশ্যরূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও লেখার অভ্যাস হবে। এই স্তরে খেলাচ্ছলে সংখ্যা চেনার মূল্যায়নও করা যাবে।

সংখ্যা চেনার পর প্রয়োজন সংখ্যার ক্রম জানার। মার্বেল গুলি বা সহজলভ্য বস্তুর সাহায্যে সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে সংখ্যার উর্ধক্রম অধঃক্রম শিশুরা নিজে নিজে সাজাবে। নানান অনুশীলনীর মধ্য দিয়ে সংখ্যাক্রম সম্পর্কে ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হবে।

পরবর্তী ধাপে শুরু হবে - কম বেশী সংখ্যাকে কীভাবে অ-সমান ($\neq$) থেকে সমান করা যায় ($=$)। শুরু হবে যোগ প্রক্রিয়া ($+$) এবং বিয়োগ প্রক্রিয়ার ($-$) ধারণার বিকাশ। প্রথমে শুরু হবে যোগের ধারণা (অনধিক সমষ্টি-৯)। পরবর্তী ক্ষেত্রে শুরু হবে বিয়োগের ধারণা (বিয়োগফলে দশকের সংখ্যা থাকবে না)।

পরবর্তী ধাপ- বস্তু/ মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে '0' শূন্যের ধারণা। শূন্যের ধারণা সম্পূর্ণ হবার পর প্রয়োজন– সংখ্যার বিকাশ অর্থাৎ দশকের ধারণার বিকাশ। একে শূন্য-১০-ধারণা দেওয়া বিধেয় নয়, ধারণা তৈরী করতে হবে ঃ-

দশক – একক / অর্থাৎ এক দশক, শূন্য একক।

১ ০

এইভাবে সংখ্যার বিকাশ করা যাবে অসীম পর্যন্ত। সংখ্যার মান ১-৯৯ পর্যন্ত জানবে।

এইভাবে শুরু করলে গণিত ভীতি থাকবে না। এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

অঙ্ক নিয়ে মজা

ঋত্বিক ত্রিপাঠী

কে যে কবে কেন বলেছিলেন ঃ জীবনের সব অঙ্ক মেলে না!

তবে অঙ্কের উত্তর মেলে, যদি তার পদ্ধতি হয় সঠিক। সঠিক পদ্ধতি হতেই পারে সহজ কিংবা কঠিন। কী জীবন কী অঙ্ক– উভয়ক্ষেত্রেই চাই সহজ রীতি। তবেই না জীবনানন্দ। হ্যাঁ অঙ্কের মধ্যেও থাকে সেই আনন্দ, যার মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় আয়ু। অর্থাৎ আয়ুর জন্য চাই অঙ্কের মজা।

সাধারণের ধারণা 'অঙ্ক' শব্দটির মধ্যে আছে অবশ্যম্ভাবী কাঠিন্য। তা কিন্তু নয়। পদ্ধতি যদি হয় আধুনিক ও অনুষঙ্গযুক্ত, তবে তার কাঠিন্য সেরে গিয়ে জন্ম নেবে মজা।

গণিত মেলার গান

কথা ও সুর ঃ উৎপল মুখোপাধ্যায়

যাবুনি, যাবুনি ইস্কুলে
মোর অঙ্ক লাগে ডর
ম্যাস্টর কেলাসে আইলে
বুক করে ধড়ফড় ।
নিত্য পাঠাও মুদির দুকান
খাতায় লেখে ধার ।
ধার করা অঙ্কে মোদের
আছে কী দরকার ।
বাপ বুঝায় ওরে বেটা
যাব গণিত মেলা ।
সেথায় নাকি অঙ্ক লিয়ে
চলছে নানান খেলা ।
মেলায় গেলে বুলবে ম্যাস্টর
বুধন অঙ্ক কর ।

মুই যাবুনি অমন মেলা
গণিতে মোর ডর ।
বাপে বুঝায়, মায়ে বুঝায়
বুধন এসে মেলায় ।
সংখ্যা লিয়ে মেতে গেল
গণিত গণিত খেলায় ।
উড়ে গেল ভয়ের পাখি
কোথায় গণিত ডর ?
বুঝল বুধন জীবন পথে
গণিত তো নয় পর ।
সাধন, বুধন, লতা, মিতা
যাদের গণিতে ডর ।
এসো সবাই গণিত মেলা
এসো গো সত্ত্বর । ।

এক থেকে দশ

প্রদীপ দেব বর্মন

'এক' ঘুমেতে স্টেশন ঘুম
'দুই' ঘুমেতে নদী,
'তিন' ঘুমেতে সাগর পেরুই
জাহাজ মেলে যদি।

'চার' ঘুমেতে বিদেশ ঘুরে
আসবো কয়েক দিনে,
'পাঁচ' ঘুমেতে পিঙ্কি সোনার
খেলনাপাতি কিনে।

'ছয়' 'সাত' আর 'আট' ঘুমেতে
ফুসু মামন বশ,
ঘুম ঘুমিয়ে শিখে গেলাম
এক থেকে 'নয়' 'দশ'।

অঙ্কের গান-১

কথা ঃ আনসার উল হক
সুর ঃ রতীন চক্রবর্তী

ভালোই লাগে ভাঙতে সিঁড়ি
ধপ ভেঙে ধাপ ওঠা,
ছুটির পরে খেলার মাঠে
দল বেঁধে সব ছোটা।

ভালোই লাগে পীথাগোরাস
সাইন থিটা বিটা-
টিফিন হলে হাপুস হুপুস
নলেন গুড় আর পিঠা।

ভালোই লাগে কমপিউটার
ডট-কমেতে খেলা
কেশব নাগের বই-এর পাতায়
চোখ দুটোকে মেলা।

সবচে ভালো সকাল বিকেল
মায়ের পাশে বসা,
বীজগণিতের সহজ সহজ
অঙ্কগুলো কষা।

গণিত মুখী

দেবযানী দাস মহাপাত্র

এক এক্কে এক
বইটি খুলে দেখ্।
দুই এক্কে দুই
ফেলিস নেকো বই।
তিন এক্কে তিন
বদলে গেছে দিন,
চার এক্কে চার
গণিত খুব দরকার।
পাঁচ এক্কে পাঁচ
অঙ্ক কষে বাঁচ্।
ছয় এক্কে ছয়
করিস নাকো ভয়।
সাত এক্কে সাত
হয়ে আঁট সাঁট,
আট এক্কে আট
ভয় গুলোকে কাট্।
নয় এক্কে নয়
গণিত করবো জয়।
দশ এক্কে দশ
অঙ্ক করতে বস্।

গণিত ভীতি

দীপাঞ্জন মিশ্র

গণিত নিয়ে মিছেই তুমি পাচ্ছ এত ভয়
একটু ভাবলে এই ভয়কেই করবে তুমি জয়।।
প্রথম প্রথম সব শিশুরই গণিতে ভয় থাকে
"ভাল্ লাগে না"– বলবে সবাই, শুধাও তুমি যাকে।।
কিন্তু যদি বুঝতে পারে গণিতে কি রস
সবাই তখন সবেই হবে এর কাছেতে বশ।।
চিন্তা করে গণিতটাকে করলে সমাধান
কোন বিষয়েই আনন্দ নেই গণিতের সমান।।
গণিত বাদে অন্য বিষয়ে যতই পড় খেটে
আশানুরূপ নম্বর তোমার উঠবে নাকো মোটে।।
কিন্তু গণিত বিষয়টাকে বাসবে ভাল যবে
সমাধান হলেই তুমি দশেতে দশ পাবে।।
পরীক্ষাতে হাইয়েস্ট নম্বর পেতে যদি চাও
গণিতটাকে ভালবাস, গণিত কষে যাও।।
দুনিয়ার এই অগ্রগতি গণিত আছে বলে
তাই বলি ভাই গণিত কর সব দিয়ে সঙ্কলে।।
খেটে করলে গণিতটাকে, দিলে তাকে সম্মান
অবশ্যই সে দেবে তোমায় খাটার প্রতিদান।।

অঙ্কের গান-২

কথা ঃ সিদ্ধার্থ সিংহ
সুরঃ রতীন চক্রবর্তী

যোগ বা বিয়োগ হোক, নয় গুন - ভাগ
দেখলেই ছোটোদের মুখ ভারী, রাগ।

আসলে তো ভয় পায়, দূরে দূরে থাকে
স্বাদটা কেমন যদি ভুল করে চাখে।

অঙ্ক তো মজাদার, বুদ্ধির খেলা
একবার শিখলেই মজা মেলে মেলা।

টপাটপ্ করে দেবে, যা দেবে যখন,
অঙ্ক তাদের কাছে নেশার মতন।

যোগ-বিয়োগের ছড়া

শ্রী বিভাস দাস

কদম গাছে বসে আছে চারটি শালিখ পাখি
কিচিরমিচির করে তারা করছে ডাকাডাকি
তাই না শুনে দুইটি চড়ুই আসলো তাদের কাছে
শালিখ চড়ুই মুখোমুখি বসলো কদম গাছে
দুই রকমের মিলিয়ে মোট কয়টি পাখি তবে ?
একটা একটা করে এবার গুনে দেখতে হবে।

ঘন সবুজ পাতায় মোড়া আম কাঁঠালের বনে
কালো কোকিল পাখিরা সব ডাকছে আপন মনে

গাছের ডালে বসে ছিলো চারটি কোকিল পাখি
একটি উড়ে গেলো দূরে রইলো কটি বাকি ?

আমগাছের এক ডালের উপর তিনটি কোকিল আছে
একটি নেমে এলো নীচে রইলো কটি গাছে ?

গাইছিলো গান দুটি কোকিল কুহু কুহু সুরে
রইলো বাকি কয়টি যখন একটি গেলো উড়ে ?

গণিত উৎসব- ২০১৯

অমিত রাণা

আয়রে দুলু, আয়রে ভোলা
খেলবি চলে আয়,
গণিত নিয়ে খেলতে চলো
গণিত উৎসবে যাই।

গণিতের সব সমস্যাগুলি
করতে সমাধানের ভয়,
সহজ সরল মজার গণিত
দিয়ে করবো মোরা জয়।

রঙচঙে সব শিখন উপকরণ
আকর্ষনীয় সব মডেল,
এসব দেখে গণিত শিখে
পাবো মোরা মেডেল।

আয়রে দুলু, আয়রে ভোলা
আয়রে খাকুড়দায়,
সবাই মিলে দলবেঁধে
গণিত উৎসবে যাই।

আবাহন

বিপ্লব কুমার সাউ

শিশু পড়ে আপন মনে
সন্ধ্যা ও সকালে
আঁকি বুকির খেয়াল খাতায়
লিখতে সে যায় না ভুলে।।
'অংক' যখন করতে সে যায়
মেলে চারদিক চোখদুটি
চারদিকে ছড়িয়ে থাকা
জিনিস থেকে নেয় খুঁটি।.
এটি এক এমন বিষয়
লাগে না সবার ভালো
এই হতাশা করতে দূর
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো।.
আসুন, সবাই মিলে জ্বালতে প্রদীপ
ভগবতী দেবীর অঙ্গণে।
সার্থক হোক 'গণিত উৎসব'
সম্প্রীতির এই মহামিলনে।।

গণিত মেলা

সঞ্জীব নন্দী

গণিত নিয়ে করছি খেলা
সারাজীবন ধরে।
তবুও কেন এতো ভয়
ফিরছে বারে বারে।
তাই মোরা সহজ করে
ভাবছি, ভাবছি অবিরত,
আঁকব ছবি, গাইবো গান
তোমার মনের মতো।
ফেলে দেওয়া জিনিস থেকে
হচ্ছে গণিত মডেল।
মজা পেতে গণিত মেলায়
ভীড় জমাও অঢেল।
খেলতে খেলতে শিখব গণিত
যদি আস মেলায়।
প্রতিযোগিতা ক্যুইজ, অঙ্কন
শুধু তোমাদের বেলায়।
সময়টা মনে রেখো সেপ্টেম্বরের
কুড়ি - একুশ।
শুধু ঘোরা নয়, শিখব গণিত
থাকে যেন হুঁশ।।

অংক করবো জয়

নিভা মান্না

অংক নিয়ে বসলে পরে আমার তখন কি যে হয়,
বইগুলো দেখে আঁতকে উঠি, যোগ-বিয়োগে ভীষণ ভয়।
দুয়ে দুয়ে যোগ দিলে কেবলই যে হয়ে যায় শূন্য,
চোখ রাঙিয়ে বাবা বলে-হাঁদারাম, যোগ কি বিয়োগ ?
আর একবার করলে ভুল তোমার ফাটিয়ে দেবো মুন্ডু।
ভয়ে ভয়ে গিঁট গুনি, আঙুলগুলো কাঁপতে থাকে,
পাশে বসে দাদা আমার পাটিগণিতের অংক কষে।
দাদাভাই ডেকে বলে চল তবে খেলা করি,
অংক নিয়ে মজার খেলা, আজকে তবে ওটাই ধরি।
অনেক কষাকষির পরেও; একে একে গুন,
কি করে যে হয়ে গেলো দুই।
চাঁটি মেরে দাদা বলে- "কিচ্ছুটি শিখলি না তুই",
মা তখন ডেকে বলে পারবি বাবু মজার ছলে
শিখিয়ে দেবো আবার।
ইস্কুলেতে দিদিমণি ডেকে বলে, ওরে তোরা শোন শোন,
আয় তোরা সবে মিলে, সুরে সুরে নামতাটা গোন।
সেদিন দেখি ইস্কুলেতে, কত রকম অঙ্ক লেখা দেওয়াল জুড়ে
ছবির মধ্যেই বোঝানো আছে, জটিল সব হিসেব ছেড়ে।
আমরা ভাবি অঙ্ক তবে সত্যিই মজার,
এতোদিন মিছেই শুধু ভয় ভয়
আজ থেকে ভয় নয় আর, অংককে এবার
করবোই জয়।

নামতার ছড়া

গণেশ চন্দ্র বারিক

এক একে এক
এক দুগুনে দুই।
এসো মোরা সবাই মিশে গণিত মেলায় যাই
দুই একে দুই
দুই দুগুনে চার
আনন্দতে খেলব মোরা ঘুরবো চারধার।
তিন একে তিন
তিন দুগুনে ছয়,
গণিতের ভীতি এবার কাটবে নিশ্চয়।
চার একে চার
চার দুগুনে আট।
হাতে কলমে শিখবো মোরা গণিতের পাঠ।
পাঁচ একে পাঁচ
পাঁচ দুগুনে দশ।
গণিতের মাস্টার মশাই হবেন এবার বশ।
ছয় একে ছয়
ছয় দুগুনে বারো।
খাকুড়দা গণিত মেলায় সবাই আসতে পারো,
সাত একে সাত
সাত দুগুনে চৌদ্দ
অংকে বকুনী খাওয়াটা হবে এবার রদ্।
আট একে আট
আট দুগুনে ষোলো
বাবা মা, মাস্টার মশাই এবার আমায় বাসবেন ভালো।
নয় একে নয়
নয় দুগগুনে আঠারো।
গণিতমেলার উপকারিতা সবাই বুঝতে পারো।
দশ একে দশ
দশ দুগুনে কুড়ি
এবার অংকতে নাম্বার মোরা পাবো ঝুড়ি ঝুড়ি।

এই সময়, আমি ও আমরা

ডঃ সিদ্ধার্থ শংকর মিশ্র

একা পথ চলতে পারি, অনেক কাজ করতে পারি, একা প্রশংসা পাই সমালোচিতও হই। কতটা পথ এগোতে পারি ? একা যতটা সম্ভব। এগোতে হবেই যদি জীবন চাই। তার জন্য চাই একতা। ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে আরও বেঁধে বেঁধে থাকতে। এই আমাদের ঐতিহ্য। এই বিমুখ সময়ে একা একা পালিয়ে যাওয়া নয়। আমাদের যৌথতা হোক আমাদের আয়ুধ। আসলে সম্পর্কগুলো ধরে রাখা এখন বড় জরুরী এই একক মানসিকতার যুগে।

আর ঠিক এই কারণে প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট, শিক্ষা আলোচনা, পশ্চিম মেদিনীপুর ও আমাদের প্রতিষ্ঠান যৌথ উদ্যোগে গণিত উৎসবে মেতেছি। আমার বাবা অঙ্ক জানেন না তাই তোর অঙ্ক হবে না, আমার শিক্ষকের এই মত পোষণের পরেই মনে হয়েছিল আমার বাবা পারেননি আমিও পারবো না। আজ আমি মনে করি আগে শিক্ষককে ভালোবাসা তারপর বিষয়কে, এইটা হয় না তাই হয়তো পিছোচ্ছি। শিক্ষক ও বিষয় এই দুইয়ের ভালোবাসার টানে আজকের আমার গণিতের প্রতি আকর্ষণ ও তার প্রকাশ গণিত উৎসব।

গণিত উৎসব হবে কিন্তু কিভাবে হবে, কে নেতৃত্ব দেবেন, আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তখন রাজ্যে প্রথম হওয়া এই ধরনের উৎসব যা কলকাতার অনাথ আশ্রম বিদ্যালয়ে হয়েছিল যার প্রধান শিক্ষক শ্রী উৎপল মুখোপাধ্যায় তিনি এগিয়ে এলেন। ছুটির দিনে কর্মশালা, কলেজের হবু শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষা আলোচনার শিক্ষকবৃন্দ ও বিশেষ করে যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই অসাধ্যসাধন

হতো না তাঁরা অভিভাবক এই সবে মিলে এক কর্মমুখর, আনন্দময় কাজে আমরা যুক্ত হলাম। কয়েকদিন নিরলস পরিশ্রমের ফলে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রস্তুত হলো। এর পর হলো শিশুদের প্রশিক্ষণ যারা কর্মশালায় গণিত উপকরণ সহযোগে বিষয়টি বোঝাবে। শিশুরা প্রস্তুত দুদিনের শিক্ষক হবে, আমরাও প্রস্তুত তাদের সহযোগী হিসেবে। ক্যুইজ, অঙ্কন, অরিগেমি নানা মাধ্যম নিয়ে আমরা প্রস্তুত শিশুর মধ্যে গণিত আকর্ষণ বাড়ানোর লক্ষ্যে। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আমরা সফল হবোই।

একদিন বা দুদিন গণিত উৎসব হলো আর সব দর্শনার্থী/ শিক্ষার্থী গণিতে উৎসাহী হলো, আগ্রহী হলো, সম্পূর্ণ ভয় দূর হলো এমনটা নাও হতে পারে। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে, প্রতিদিনকার চলার পথে থাকবে গণিত উৎসবের পরশ, এই পরশ এনে দেবেন সম্মানীয় শিক্ষক ও অভিভাবক। আমাদের বাড়ি ও পাঠশালা হবে গণিত কর্মশালা তাতেই গণিত উৎসবের সার্থকতা।

প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের ভিত্তি কিন্তু নানা ভাবে আক্রান্ত। তবে এই থেকে মুক্তির পথ ও অনেক। একা ভেবে হবে না অনেককে ভাবতে হবে, আলোচনা করতে হবে, মানুষকে যুক্ত করতে হবে। অনেককে একসাথে চলতে হবে। শুধু গণিত নয় নানা সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। পরিশেষে বলি গণিত উৎসবের মতো সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়েছে আপনারা সাথী হয়েছেন বলে। ভবিষ্যতে শিক্ষার মানোন্নয়নে সঙ্গী হতে চাই আপনারা সবাই সাথী হলে।